বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতি

কা ম রু ল ই স লা ম

পাল ও সেন আমলে বাংলা ভাষার চর্চা হয়নি। রাজভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সংস্কৃত চর্চা-ই হয়েছে মূলত। এ সময় অবধি এ ভাষা উচ্চবিত্তের সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেনি এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখেই এর অস্তিত্ব টিকে ছিল। মুসলিম বিজয়ের পর কবিরা মুখে মুখে এ ভাষার চর্চায় উৎসাহী হয়েছেন এবং সে সময়ে আরবি-ফারসি শব্দের আত্তীকরণ বাংলা ভাষাকে বিকশিত করেছে। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনের মুসলমান শাসন আমলে এ ভাষার চর্চা ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। মুসলমান সুলতানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এবং বিশেষ করে হোসেন শাহি আমলে এ ভাষার বিকাশ এবং বৈষ্ণব রচনার দ্বারা এর উন্নয়ন একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

ব্রিটিশ বেনিয়ারা উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রারম্ভেই চেষ্টা চালিয়েছে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের সাম্রাজ্য বিস্তারেরও। একথা অনস্বীকার্য, ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষার, বিশেষ করে আধুনিক বাংলা গদ্যের সূত্রপাত এবং বিকাশ হয়েছে। তবে এটাও ঠিক, ব্রিটিশরা নির্মোহভাবে এই বাংলাচর্চার সুযোগ দেয়নি, মূলত চেয়েছে তাদের নিজের ভাষা শেখাতে। কারণ, কোনো জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রথম শর্তই হল আধিপত্যবাদীর নিজ ভাষারও আধিপত্য বিস্তার এবং বিজিত জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাই, তাদের সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শনেরও চালান এসেছে তাদেরই সঙ্গে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই আমদানিই আমাদের পাশ্চাত্যভূমির আধুনিক মননজীবিতার আস্বাদ দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্যের আধুনিক দিগ্বলয়ের সঙ্গে আমাদের অন্বিষ্ট করেছে, যদিও তথাকথিত এই আধুনিকতা আমাদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং উপনিবেশবাদীদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়েছিল আমাদের সামাজিক জীবন ও জীবনবোধের সবকিছু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা ভাষার আয়োজনও। কলিম খানের মতে, ’ইউরোপ কেবল ভারতে উপনিবেশই স্থাপন করেনি, ভারতীয়দের জীবনের সর্বত্র তার ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, মনে, জীবিকায় শিল্পে সাহিত্যে এক কথায় সমগ্র জীবনযাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।’ তবে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একথা বলা যায়, ঔপনিবেশিক হাওয়া জলে সে তার আপন ঐশ্বর্য নিয়ে বাড়তে না পারলেও বিকশিত হয়েছে, সে যে মানদণ্ডেই হোক। উত্তর ঔপনিবেশিক সময়েও আমাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে হচ্ছে ঐতিহাসিক কারণেই।

বিদ্যাসাগর শেক্সপিয়র অনুবাদ করেছেন, বঙ্কিম স্কট আত্মস্থ করেছেন, মাইকেল

মধুসূদন দত্ত তো একেবারে খ্রিস্টানই সেজে গেলেন একদা এক মোহে এবং নিজ ভাষাকেও অবজ্ঞার দুঃসাহস দেখালেন। বলতে গেলে তাঁর এই মোহই বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে মুক্তি দিয়েছে, বাংলা ভাষারও উৎকর্ষ সাধন করেছে। পাশ্চাত্যের নাটক, কবিতার অভূত গ্রহণ এবং বাংলা কাব্যের তো বটেই, তিনি বিদ্রোহটা দেখিয়েছেন সুদৃঢ়ভাবেই বাংলা ভাষার মন্থর মেজাজের বিরুদ্ধে, প্রথম বাংলা ভাষায় ট্র্যাজেডি রচয়িতা হিসেবেও তিনি সর্বাগ্রের। রামমোহনের প্রতিবাদী চরিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে বাংলা গদ্যের যে বিকাশ, তাকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের ইতিহাস হতে পারে না, যদিও তাঁর ভাষা লোকভাষার স্পর্শ পায়নি। রামমোহন বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করেছেন বিপর্যয়ের হাত থেকে। বিদ্যাসাগরের, সংস্কৃত বাদে, (সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়েও) সাধারণের মুখের ভাষাকে লেখ্য ভাষার রূপ দিয়ে তাকে গদ্যের বাহন করে ভাষার বিকাশকে বাংলা গদ্যের একটি সৌভাগ্যের পর্যায়ই বলতে হবে। তার হাতে এই ভাষা সাবলীল প্রবহমানতা অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার মূল ভূমিকে সৌকর্য দান করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, সেখান থেকে তা ফুলে ফলে নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, 'রামমোহন বঙ্গ-সাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্বব্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়েছেন।' (আধুনিক সাহিত্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র) আর সেই পলি স্তরেই নানাভাবে ফসল ফলালেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এবং অন্যরা।

ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে তার একটি ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'কিন্তু অধীনতার ভিতরেও বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছিল, সেটি ছিল স্বাধীনতার জন্য সাধনা। ... জয় ছিল বাংলা ভাষার চর্চায়, ইংরেজিকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে ব্যবহার করে। ভিক্ষুকের মতো নয়, প্রভুর মতো। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এঁরা কেউ ইংরেজি কম জানতেন না, ইংরেজিতে এঁরা লিখেছেনও, পরে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার পেলেন সেও তো তাঁর নিজের করা বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের জন্যই,...। তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান ছিল, আর ছিল দেশপ্রেম, যে জন্য তাঁরা বাংলার পথে এসেছেন, জেনেছেন সেইখানেই সিদ্ধি, ওই পথেই মুক্তি যেমন তাঁদের সৃষ্টিশীলতার তেমনি তাঁদের দেশবাসীর (ভাষা ও স্বাধীনতা)।' কলিম খানের মতে উপনিবেশের ফলে 'বাংলা ভাষা বাস্তবিকভাবে তার সাম্রাজ্য হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় পরিণত হয়।' এই আধুনিকতার মধ্যে কিছুটা গলদ থাকলেও বাংলা ভাষা যা প্রাকৃতজনের মুখে মুখে বেঁচে থেকেছে অনেক কাল এবং বিকশিত হয়েছে, যে ভাষার প্রবহমানতা কখনো রুদ্ধ করতে পারেনি কেউ কিংবা যে ভাষা স্বতন্ত্র ও স্বাভাবিক, সে ভাষা শাসকদের কর্তৃত্বে কিছুটা জৌলুস হারালেও একেবারে উদ্বাস্তু হতে পারে না। বাংলা ভাষা ঔপনিবেশিক সময়েও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে

ক্রিয়াশীল ছিল এবং তার আধুনিক হয়ে ওঠায় উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ের চিন্তা করা যে হারানোর কথা ভাবছেন তা আসলে একধরনের পাওয়াও বটে। তবে পাশাপাশি একথা মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা নেই, উপনিবেশ বাংলা ভাষাকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে অনেকখানিই বাধাগ্রস্ত করেছে, তার ব্রাত্যবিকাশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগোতে দেয়নি। তবে বিজয়টা এখানে যে, আফ্রিকার অনেক দেশের মতো বাংলা ভাষাকে সাম্রাজ্যবাদ একেবারে নিঃশেষ কিংবা পঙ্গু করতে পারেনি বরং বিচিত্র প্রতিবন্ধকতায় বাংলা ভাষার ডানায় আরো শক্তি এসেছে এবং ভাষার কারণেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্থবহ হলে, গণতন্ত্রের কাঠামো সুদৃঢ় হলে ভাষাও স্বাধীন হবে, আরো বিকশিত হবে। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বাধীনভাবে চলতে হলে স্বৈরাচার ও মৌলবাদকে রুখতে হবে সর্বাগ্রে এবং রাজনৈতিক-সংস্কৃতিতে আনতে হবে গণতন্ত্রচর্চার ব্যাপকতা। আর ভাষা যে সমষ্টিনির্ভর, জ্যাক দেরিদার এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

কোনো ভাষা প্রাণ পায় সেই ভাষায় রচিত কবিতায়। কবিতা ও ভাষার ইতিহাস প্রায় একই সময়ের। কারণ, কবিতার মধ্যেই ভাষা বিকশিত হয়, বেড়ে ওঠে, হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে যায় বলিষ্ঠভাবে।
কানাডিয়ান কবি ও ঔপন্যাসিক মার্গারেট এটউড এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ঋসড় শপ হসপয়ড়ী মড় ভপড়প য়ভপ লথষবৎথবপ মড় ড়পষপাপন. ওফ হসপয়ড়ী ংথষমড়ভপন লথষবৎথবপ াসেৎলন দপধসশপ নপথন. ... ওয়'ঢ় য়ৎড়প য়ভথয় হসপয়ড়ী নসপঢ়ষ'য় শথরপ শসষপী. দৎয় মঝ়ঢ় য়ভপ ভপথড়য় সফ য়ভপ লথষবৎথবপ.' একজন সৃষ্টিশীল লেখকের জন্য তার নিজস্ব ভাষা তৈরি জরুরি। আর নিজস্ব, নতুন ভাষা কেবল কবিতার মাধ্যমেই তৈরি হয়। যে কারণে আমরা দেখেছি জয়েস-ফকনারসহ পৃথিবীর অনেক বড় বড় গদ্যশিল্পীই প্রথম জীবনে কবিতা চর্চা করেছেন। অবশ্য একথা সবারই জানা, উত্তীর্ণ গদ্যশিল্পও কবিতা। যে কারণে আজকে কবিতা ও ফিকশনের ব্যবধানটা কমে আসছে সঙ্গতকারণেই। যা হোক, বাংলা ভাষা মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ হয়ে এক বিশেষ পর্যায়ে এসেছে আজ, যা নিয়ে বাঙালি গর্ব করতে পারে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের দরবারে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ভাষা মুক্ত আকাশে উড়াল দেওয়ার সানন্দ সাহস পেয়েছে। তাঁর শিল্পমানস, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপৃত থেকেছে চিরকাল। অবহেলিত এই ব্রাত্যজনের ভাষায়ই, যা ছিল এককালে সংস্কৃতির কাছে অপভ্রংশ, তিনি সাহিত্য করে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এ ভাষার অন্তস্থ স্রোতে এক অমেয় শক্তির জোগান দিয়েছেন; আরবি-ফারসি শব্দের সফল প্রয়োগে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক বিশিষ্ট মাত্রা যোগ করেছেন যা কেবল কালজয়ী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই হয়ে ওঠার দীর্ঘ পথে ছড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত ইতিহাস। বাঙালি সংস্কৃতির স্বাধীন চলার পথ এখনো বঙ্কিম, নানাবিধ শত্রুতায় বিশীর্ণ তার সজীব প্রত্যয়। ইংরেজরা আজকে নেই। সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ শেষ হলেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার তো সমাপ্তি ঘটেনি। নয়া কৌশলে, নয়া ইজম, দর্শন এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আওতায় আজ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো নানাভাবেই নানা বঞ্চনার শিকার এবং এও সত্যি, তাদের কৌশলী দয়া-দাক্ষিণ্যের উৎপাতে আমরা স্বয়ম্ভরতার সমূহ সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে ক্র্যাচ-সর্বস্ব পঙ্গু অর্থনীতির উপাসনায় লোটস-ইটার্সদের মতো আলস্যে দিনযাপন করছি। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সর্বৈব ক্লেদ-গ্লানি রপ্তানি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। স্যাটেলাইটের বদৌলতে আকাশপথে (আধুনিক প্রযুক্তি আমদানির সঙ্গে সঙ্গে) বিদেশী আগ্রাসী সংস্কৃতিও পণ্য হিসেবে আমদানি আমাদের জাতিসত্তার প্রতিই এক প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আমাদের এই ভয়াবহ রাজনৈতিক অরাজকতা, স্বৈরাচার, গণতন্ত্রের নামে অনাচার এবং মৌলবাদের অশুভ আচরণ সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা মাফিক দেশীয় দালালদের দ্বারা সৃষ্ট, যা আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রাকে ক্রমাগত নিশ্চল ও অকেজো করে দিচ্ছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায়, নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমূহ বিপদের গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে সর্বাগ্রে দরকার স্বয়ম্ভর অর্থনীতি এবং দেশাত্ববোধ। তারও আগে দরকার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং বিদেশের যা কিছু ভালো সুস্থ জীবনমুখীনতায় উন্মুখর তা গ্রহণ করা এবং পঙ্কিলতা, কদর্য-ঠুনকো, কুরুচিপূর্ণ, ধনতন্ত্রের মাদকতাপূর্ণ সংস্কৃতি নামক পণ্যসামগ্রী প্রত্যাখ্যান করা। গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেই কোনো জাতির সংস্কৃতি বেঁচে থাকে, গতি পায় আর তার অভাবেই তা শুকিয়ে যায়, বন্ধ্যা হয়ে যায় একথা মনে রাখতে হবে। বিদেশী অপসংস্কৃতির অভিযানকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটি যে খুব সহজ নয় সেসব মনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে। বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতি সব সময়ই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে বিকশিত হয়েছে; এই দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধ স্রোতে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই যদিও, তবুও ভাবতে হবে আজকের দ্বন্দ্বটা পুরোনো দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি নয় বরং অনেক, অনেকখানিই নতুন কৌশলে আকীর্ণ, সর্বপ্লাবী এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যের; যদিও অভিন্ন উদ্দেশ্যে লালিত এবং সংক্রমিত। এরই মধ্যে, এইসব চিরায়ত দ্বন্দ্ব এবং ভয়াবহ অরাজক ভূমি-বাতাসেই বাঙালি তার হাজার বছরেরও বেশি এই সংগ্রামী ঐতিহ্য প্রবাহকে সমুন্নত রেখেছে তার সাহিত্য-শিল্পে, জীবনাচরণে, বোধিতে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের শিল্পগত সাযুজ্যের সূত্রটি নিতান্তই স্থূল এবং অপরিণত হেতু শিল্প-সাহিত্যের মতো সৃষ্টিশীল কাজ এখানে উৎস ও মেধা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকভাবে দাঁড়াতে পারছে না এবং চিন্তনের ক্ষেত্রে এখানে ব্যাপক সংগ্রামী অনুধ্যান নেই, যতটা আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের। তবে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, আমাদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের আঙ্গিক উঠোন

পঙ্গু অর্থনীতির মতো একেবারে সংকীর্ণ নয়; সেখানে অন্তত দাঁড়ানো যায়, জোছনা রাতে মাদুর পেতে বসে একসঙ্গে গল্প করে অনেক রাতঅবধি জোছনার অমৃত পানে কিছুটা পথ ভেসে যাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের আজকে, প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরানোর তাগিদ দেখা দিয়েছে এবং উত্তর ঔপনিবেশিক শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার যে পথে আজকে সারা বিশ্ব আলোড়িত, সেই পথ পরিক্রমণ এবং সৃষ্টিশীল কাজের প্রাবল্যে নতুন করে পরিচিত হওয়ার যে সময় আজ দুয়ারে, তাকে বুঝতে হবে এবং ঝেঁটিয়ে ফেলতে হবে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, দাসত্বের অভ্যাসগত জীবনপরিধি। শিল্প-সাহিত্য চর্চার ঔপনিবেশিক মানদণ্ড ছেড়ে ফিরতে হবে ঘরে।
৩০-এর দশকে বাংলা সাহিত্যের একটি বিপ্লব ঘটে যায়। ৫০ এবং ৬০-এর দশক হয়ে ক্রমবিকাশমান বাংলা সাহিত্য মুক্তিযুদ্ধের ঐশ্বর্য শরীরে মেখে এক নতুনতর প্রাতিস্বিকতায় আবির্ভূত হয়েছে। আধুনিক অস্তিত্ববাদী দর্শন এবং চেতনাপ্রবাহ টেকনিক (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস) আমাদের উপন্যাসে এসেছে। স্বাধীনতা-উত্তর নাটকেও একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে এবং সেলিম আল দীন, সাঈদ আহমেদ প্রমুখরা আন্তর্জাতিকভাবে নন্দিত, পুরস্কৃত হয়েছেন। আমাদের কবিতা, ছোটগল্পও আজ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় গৌরবোজ্জ্বল অবস্থানেই দাঁড়িয়ে আছে স্বতন্ত্র সৌরভে। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য করার তাগিদ দেখা যাচ্ছে তরুণ লেখকদের মধ্যে। বাঙালি তার হাজার বছরেরও বেশি দাসত্ব এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ’৫২-এর ভাষার সংগ্রাম থেকে স্বাধিকার এবং ’৭১-এ স্বাধীনতার লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বের দরবারে এক আলাদা, স্বাধীন-সার্বভৌমত্বের পরিচয় নিয়ে আজ সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। নানাভাবে নানা জাতির, ভাষার নিগড়ে, অবাঞ্ছিত আচরণে-অত্যাচারেও সে তার স্বাভাবিক স্বপ্নগুলোকে লালন করেছে সযত্নে। এইসব অনুষঙ্গে, এ জাতির হয়ে ওঠার দীর্ঘ কষ্ট-ক্লিষ্ট পথে নানা ভাষার নানা সংস্কৃতির গন্ধ স্পর্শ তার নিজস্বতাকে সমৃদ্ধও করেছে এবং আজকের এই বাংলা ভাষায় নানা জাতির ভাষা ও শব্দের সংমিশ্রণ সত্ত্বেও তা আমাদের ঐতিহ্যকে স্পর্শ করেছে এবং বলতে গেলে বাংলা ভাষার এই সর্বগ্রাসী, সংগ্রামী প্রতিবাদী চরিত্র পৃথিবীতে বিরল। তাই, এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এই ভাষায় রচিত শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক আলাদা প্রতীতি গড়ে তুলতে হবে মননশীলতার ঐশ্বর্যে, বস্তুনিষ্ঠ স্বভাবে ও শৈলীতে।

জনগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়েই কেবল এই ভাষার বিকাশ ও লালন ত্বরান্বিত হতে পারে, এই ভাষা চিরকালই ছিল অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাষার এবং বলতে দ্বিধা নেই, ভারতবর্ষে তুর্কি আক্রমণ সংঘটিত না হলে বাংলা ভাষার মুক্তি ও বিকাশ এত সহজে হয়তো সম্ভব হত না। এই অবহেলিত জনগণই ’৫২ তে রুখে দাঁড়িয়েছে একসঙ্গে ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এবং যেহেতু জনগণের সর্বাত্মক রাষ্ট্র ছাড়া ভাষার স্বাধীন বিকাশ অসম্ভব, সেহেতু আজকে সেই সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের জন্য এদেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকেই এগিয়ে আসতে হবে প্রস্তুত

মানসিকতা নিয়ে একসঙ্গে।
সংস্কৃতি মূলত বিকাশ-প্রয়াসী একটি প্রবাহ যা কোনো জাতি বা গোত্রের নতুন চিন্তা, উদ্ভাবন-আবিষ্কার এবং গতিশীল চিন্তার মধ্যে বিকশিত হয়। এই বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেলে সে জাতিকে বন্ধ্যা জাতি ছাড়া আর কী-ই ভাবা যেতে পারে। আর বদ্ধ স্রোতের জলাশয়ে যেমন সবকিছু পচে-গলে গন্ধ হয়ে যায়, সব কিছু বিকৃত হয় অসম্ভব অসুন্দরে ভরে যায় জলাধার আমরা কি সেই রকম অবস্থার আলামত দেখতে পাচ্ছি না আমাদের রাষ্ট্রনামক এই ব্যাধিগ্রস্ত জিনিসটিতে? মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশ কেবল সে রকম সমাজেই সম্ভব যেখানে শোষণ-বঞ্চনার স্থান নেই, নেই কোনো বৈষম্যের প্রচল। সংস্কৃতিও তার বিকাশের জন্য চায় এ রকম অনুকূল পরিবেশ। হাসান আজিজুল হক এ সম্বন্ধে বলেন, 'সন্দেহ নেই সংস্কৃতি শ্রেণী আর তার অবস্থা নিয়ে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু মানুষের দুর্জয় প্রাণশক্তি ও সৃজনক্ষমতার রূপায়ণের ক্ষেত্রেও বটে সংস্কৃতি।...শ্রেণীর দিক থেকে দেখার চেষ্টা করলে তাহলে বলতেই হবে মানুষ সবরকম শ্রেণীশোষণ ও পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করলে একমাত্র তখুনি সম্ভব কোনো দেশের মানবগোষ্ঠীর সৃজনক্ষমতার পরিপূর্ণ মুক্তি। সেটা যদি ঘটে, সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ও বৃদ্ধি তখন আর ঠেকিয়ে রাখার নয়।' (সংস্কৃতি নিয়ে)
সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ তখনই সম্ভব যখন তা নিম্নবিত্তের সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির শ্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সমন্বিতভাবে এগিয়ে যাবে। মধ্যবিত্তের এই সংস্কৃতি-বিচ্ছিন্নতা আমাদের সামগ্রিক শিল্পচর্চায় এনেছে স্থবিরতা। এ প্রসঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'যাকে বাঙালি সংস্কৃতি বলে ঢাক পেটানো হয় তা যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মপ্রবাহ ও জীবনযাপন থেকে প্রেরণা নিতে না পারে তো তাও অপসংস্কৃতির মতো উটকো ও ভিত্তিহীন হতে বাধ্য।...যার সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে না, তার রাজনীতির ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভবনা কম'। (সংস্কৃতির ভাঙা সেতু) আমাদের সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় যে প্রাণহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা, তার প্রভাব পড়েছে আমাদের রাজনীতিতেও। ফলে, যা কিছু হচ্ছে রাজনীতির নামে তা এক ধরনের ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়; এ ধরনের রাজনীতি থেকে নিম্নবিত্ত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের সম্ভবনা তো নেইই বরং তা তাদের আরো ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকার মৃত্যুগুহায়। তাই সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় প্রাণপ্রবাহ পেতে হলে নিম্নবর্গীয় মানুষেরও সাবলীল সম্পৃক্ততা দরকার। এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হল, এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব নিতে হবে একটি সুস্থ অখণ্ড সংস্কৃতি চর্চার প্লাটফর্ম তৈরির। কারণ, সংস্কৃতিতে গলদ থাকলে তা রাজনীতিতেও থাকবে এবং সেই ধরনের রাজনীতি দেশ বা মানুষের কোন কল্যাণে আসবে না। বরং তা জন্ম দিবে বিকলাঙ্গ, রুচিহীন, শেকড়-বিচ্ছিন্ন নেতানেত্রী, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের রাজনীতিক নয়।
কোনো জাতির নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সেই জাতির প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে শাসন-শোষণের পথকে সুগম করার লক্ষ্যে সেই জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায় প্রভুত্বকারী বিদেশী শক্তি। কেনিয়ার ঔপন্যাসিক

নগুগি ওয়া থিয়োংগো সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফ্রিকার ইতিহাস বিকৃতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রভুত্বকারী জাতি বিজিত জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করে লেখার প্রয়াস চালায়।' আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি উপমহাদেশেও ব্রিটিশরা ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস চালিয়েছে আর এই বিকৃতির উদ্দেশ্যও আমাদের অজানা নয়। এই ইতিহাস বিকৃতি একই জাতির মধ্যে শাসক শ্রেণীর হাতেও হয়ে থাকে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির মধ্য দিয়ে বর্তমান শাসক শ্রেণী মূলত বাঙালি সংস্কৃতির একটি প্রধানতম প্রবাহকেই বিকৃত করার প্রয়াস চালাচ্ছে দ্বিধাহীনভাবে। ইতিহাস বিকৃতি মানেই সংস্কৃতির বিকৃতি আর বিকৃত সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা মানুষ বিকৃত মানসিকতার হতে বাধ্য। তাই, বাঙালি হিসেবে সগৌরবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের রুখতে হবে ইতিহাস বিকৃতির এই চক্রান্ত, দাঁড়াতে হবে ঘাড় সোজা করে। বিকৃত ইতিহাস যে টেকে না এক সময় সত্যেরই জয় হয় এই সত্যটা ইতিহাস বিকৃতকারী শাসক শ্রেণী বুঝেও আমল দেয় না ক্ষমতার অন্ধ মোহে। আমরা জানি, ১৯৬০-এর দশকে শাসক শ্রেণীর মদদপুষ্ট একদল বাঙালির মধ্যে এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল যে, বাঙালি হিসেবে পরিচয় দান রাষ্ট্র ও ইসলামবিরোধী। পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্র প্রধান আইয়ুব খান নিজের লেখা বই ঋড়মপষনঢ়, ষসয় গথঢ়য়পড়ঢ় -এ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে বিকৃত করে এবং আপত্তিকর ও রুচিহীন মন্তব্য করে বাঙালিকে ছোট করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। আজ, এখানে তাদেরই প্রেতাত্মারা, এই স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার ইতিহাসই শুধু বিকৃত করতে চায় না, তারা জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকাও পালটাতে চায়। এসব থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, আমরা এখন কতটা দুঃসময়ের মুখোমুখি আছি।

বাঙালি সংস্কৃতি চিরকালই অসাম্প্রদায়িক। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছে শাসন ও শোষণের সুবিধার্থে। সেই সাম্প্রদায়িকতার গর্ভেই জন্ম নিয়েছে মৌলবাদ যা আমাদের অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধনই শুধু ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত নয়, বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্যকেও ধ্বংস করতে চায়। মৌলবাদের সর্বাত্মক দৌরাত্ম্য আমাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রকে যেমন রুদ্ধ করে দিচ্ছে তেমনি প্রগতিশীল শিল্পচর্চার পথকেও সংকীর্ণ করে তুলছে। এই মৌলবাদী চক্র আবার আন্তর্জাতিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে প্রভাবিত হয়ে জড়িয়ে পড়ছে হত্যা-খুন, রাহাজানিমূলক কর্মকাণ্ডে। ইরান, ফিলিস্তিন, লেবানন, আলজেরিয়াসহ অনেক মুসলিম দেশেরই প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা ইউরোপের নানা দেশে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। অনেক লেখক, বুদ্ধিজীবীকেই আলজেরিয়ায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মিসরের মৌলবাদীরা নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক নগিব মাহফুজকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। এছাড়া মৌলবাদীরা অসাম্প্রদায়িক লেখক ফারা ফোদারকে খুন করেছে মিসরে, যিনি ছিলেন নগিব মাহফুজের বন্ধু। ভারতের কবি মহাম্মদ আলভিকে ফতোয়াবাজরা একঘরে করে রেখেছে, আত্মগোপনে বেঁচেবর্তে আছেন

তিনি। এদেশেও মৌলবাদীদের দৃষ্টি পড়েছে প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর। দাউদ হায়দার ও তসলিমা নাসরিন আজ নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। বাংলাদেশের শীর্ষ কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীন চিন্তার লেখক হুমায়ুন আজাদকে প্রাণ দিতে হয়েছে সেই নীলনকশার অধীনেই। এছাড়া মৌলবাদীরা ফতোয়াবাজদের দিয়ে নানাভাবেই এদেশের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টি করেছে যা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলছে, যে ফতোয়াবাজির শিকার হাজার হাজার মা-বোন, যারা কেউ জীবন দিয়েছে অথবা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে সারা দেশেই।
পহেলা বৈশাখের রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলাসহ বিভিন্ন মেলা, মাজার ও যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা-গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং মানুষ হত্যাসহ নানাবিধ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি সংস্কৃতিকেই মূলত ধ্বংস করতে চায়। মৌলবাদীদেরই সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সাম্প্রতিককালের বাংলা ভাই, ড. গালিব এবং কিছু জঙ্গি সংগঠনের উত্থান আমাদের আরো উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই চক্রান্তের শেকড় যে অনেক গভীরে চলে গেছে সেটা এখন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এই বাস্তবতা যেমন সুখকর নয়, তেমনি এর থেকে মুক্তিরও কোনো সহজ পথ আমাদের সামনে আপাতত নেই। কারণ, আমরা নানাভাবেই বিভক্ত, বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নানা মত ও পথ এবং অনৈক্য-অবহেলা-ই যে এই বাস্তবতা তৈরির পথকে সুগম করেছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।
স্বাধীনতার এতদিন পরও এখানে, এদেশে একটি সুস্থ-সাবলীল-স্বতঃস্ফূর্ত-রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভাবনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং ’৫২ থেকে আজ অবধি যে মহান সংগ্রামী ঐতিহ্যের সড়ক বেয়ে আমরা এতদূর এসেছি, সেই ঐতিহ্য, সহমর্মিতা, বাঙালিত্বের অহংকার ক্রমশ যেন নেতিয়ে পড়ছে, হারাচ্ছে তার উষ্ণ অহঙ্কার। এসবের মূলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসহিষ্ণু স্থূল আচরণ এবং ক্ষমতামুখী নৈরাজ্যিক মানসিকতাই মূলত দায়ী। অন্যদিকে, আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য এবং মৌলবাদের রক্ষণশীল হন্তারক সাম্প্রদায়িক প্রক্রিয়াসমূহ নানাভাবেই পিছিয়ে দিচ্ছে এগিয়ে চলার প্রত্যয় ও সম্ভাবনা। তাই এখন যা জরুরি তা হল সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা নয়, গড়ে তুলতে হবে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের সমন্বিত অখণ্ড সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে সুদৃঢ় ঐক্য। বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বুক বেঁধে এদেশের সাধারণ মানুষকেই দাঁড়াতে হবে আবারো; কারণ, নিরন্তর সংগ্রামই আমাদের এবং আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এতদূর এনেছে এবং নিরন্তর সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বেই এ জাতি এবং এর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এগিয়ে যাবে অনন্তকাল, সেই প্রত্যাশা আমাদের রয়েছে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ